অভিযাত্রী

প্রবাসজীবন চৌধুরী

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

অভিযাত্রী	৭
চড়ুই-ভাতি	১৬
পুতুল	২০
ভুল	২৬
হারিয়ে যাওয়া	৩১
ফার্স্টক্লাস	৩৭
জাগরন	৪০
মন্টুর মা	৪৭
পরিচয়	৫৩
ভিখিরী	৭১
মহাবজ্রমণি	৭৮
বেকার	৮৫
দেবদত্তা	৮৯
মণিয়া	১০১
প্রবাসের সাথী	১১৬
লখিয়া	১২৭
আলোনা	১৩২
চন্দ্রাবতী	১৩৬
উত্তরাধিকার	১৪৩
বাড়ি	১৫০
পল্টুর মা	১৫৩
শূন্যে প্রথম রাত	১৫৬
দিদির পরীক্ষা	১৬১

ভূমিকা

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক প্রবাসজীবন চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ। সেখানে তিনি দর্শনের লেকচারার। আমার পুত্র পুণ্যশ্লোক তাঁর ছাত্র। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সুমধুর। সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা। প্রবাস-জীবনকে পদার্থবিজ্ঞানও পড়াতে হতো। কারণ তিনি পদার্থবিজ্ঞানেও মাস্টার ডিগ্রীধারী। আবার দর্শনেও মাস্টার। কী করে এই ডবল ডিগ্রী লাভ করলেন তার ইতিবৃত্ত তাঁর মুখেই শুনি। শুনে অবাক হই যে, তিনি ইংরেজীরও মাস্টার—তাই ইংরেজীও পড়াতে হয়। তাহলে তো ডবল নয়, ট্রিপ্‌ল ডিগ্রী। তার উপর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার-গ্রিফিথ-মোয়াট-আশুতোষ গোল্ড মেডালিস্ট ইত্যাদি—ও পরিশেষে ডি. ফিল.। যতদূর মনে পড়ছে তিনি বলেছিলেন তাঁর স্কুল-কলেজের পদক-বৃত্তি-ভূষিত রেজাল্টের আদর্শানুযায়ী তাঁর পদার্থবিজ্ঞানের এম. এস-সি. আশানুরূপ না হওয়ায় সাহিত্যপ্রিয় প্রবাসজীবন ইংরেজীতে এম. এ. দেন। এবারও মন উঠল না তাই জ্ঞানপিপাসু প্রবাসজীবন আবার দর্শন-শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষা দিলেন এবং উচ্চ প্রথমশ্রেণী পেলেন। 'নরানাং মাতুলক্রমঃ'। অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য তাঁর মামাতো ভাই। দার্শনিকপ্রবর কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর মাতুল। দর্শন তো তাঁর রক্তে। তখনকার দিনে যোগ্যতানুরূপ কাজ পাওয়া শক্ত ছিল। বিশ্বভারতী তখনো ভারত সরকারের দৌলতে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি। তিনিও বিশ্বভারতীতে যোগ দেন সামান্য দক্ষিণায় এবং তাঁর উচ্চ আদর্শানুযায়ী বিশ্বভারতীর সেবা করে গেছেন এক অনন্য রবীন্দ্রপূজারী হিসাবে। দেশ-বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ছিল এবং কিছুদিনের মধ্যে পদোন্নতিও হয়। এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন-বিভাগের প্রধান অধ্যাপকপদে বৃত হন। সব ভালো যার শেষ ভালো। আমরা তাঁর গুণমুগ্ধেরা সানন্দে অভিনন্দন জানাই। ধন্য ধন্য করি। তবে তাঁকে যে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করতে হলো এটা তাঁর ও আমাদের পক্ষে সুখের বিষয় ছিল না। কলকাতায় সবদিকেই ভালো চলছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতি-জগতে কত প্রতিষ্ঠা ও নাম। এরপর বিদেশে নিমন্ত্রিত হয়ে অধ্যাপনা ও বক্তৃতা কার্যে প্রভূত যশ নিয়ে দেশে ফিরলেন। এমন সময় অদৃষ্ট বিরূপ হয়। হঠাৎ এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন। আমরা শোকে অভিভূত হই।

রূপবান পুরুষ ছিলেন প্রবাসজীবন। যৌবনেই তিনি ঝরে পড়লেন। এমন দুর্ভাগ্য শেলী ও কীটসকে মনে পড়িয়ে দেয়। আর গ্রীক পুরাণের এডো নিসকে। যার সঙ্গে কীটসের তুলনা করেছিলেন শেলী। প্রবাসজীবন ছিলেন প্রকৃত কবি। ভুলে গেলে চলবে না যে তিনি ইংরেজী সাহিত্যেরও মাস্টার। তাঁর ইংরেজী গ্রন্থগুলি উচ্চপ্রশংসিত—বিশেষতঃ নন্দনতত্ত্বের উপর। কিন্তু তিনি যে বাংলাতেও লিখতেন এখবর আমার জানা ছিল না। তাও ছোটগল্প। তিনি চলে গেছেন একুশ বছর আগে। এতকাল পরে তাঁর বাংলা গল্পের সংকলন বই হয়ে বেরোচ্ছে। সত্যিই অপরূপ এইসব গল্প। কথনভঙ্গীও চমৎকার। ভাষা সাবলীল। তিনি যে সাহিত্যের রাজপুরীতেও 'হাতে চাঁদ কপালে সূয্যি' নিয়ে জন্মেছিলেন এতে আমার সন্দেহ নেই। তাঁর এসব গল্পই তাঁকে অমর করবে। বেঁচে থাকলে আরো কত কী দিতেন তা ভাবতে গেলে মন খারাপ হয়ে যায়। তাঁরই ভাষায় বলি 'সবই ভগবানের লীলা'। কেমন হৃদয়বান মানুষ ছিলেন তিনি তার পরিচয় তিনি তাঁর নিজের লেখনীর সাহায্যেই রেখে গেছেন। তাঁর সহধর্মিণীর এ উদ্যোগ সার্থক।

দোলপূর্ণিমা ১৩৮৮
কলিকাতা

অন্নদাশঙ্কর রায়

অভিযাত্রী

এই কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে প্রায় কুড়ি বছর আগে। জার্মান ভাষায় রচিত বিখ্যাত একটি জীব-বিদ্যার বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ পড়ে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম। বৈজ্ঞানিকের নিজের নতুন নতুন অনেক গবেষণা পেলুম— সেগুলি যেমন বিস্ময়কর আর তেমনই তার রচনা-ভঙ্গী। জীব-বিদ্যা যে এতো আকর্ষণীয় হতে পারে তা আগে বুঝিনি। ঐ লেখকের পরবর্তী অন্যান্য রচনার জন্য মনটা যে কী উৎসুক হয়ে উঠলো! সে সময় জার্মানীতে আমার সহপাঠী বিশেষ বন্ধু যতীশ ছিল—তাকে পরদিনই বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলুম এ বিষয়ে খোঁজ করতে, যতীশ তখন বার্লিনে তার রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণা নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত—তবু পত্রপাঠই আমায় জবাবে লিখল যে ঐ বইয়ের লেখক বৈজ্ঞানিক ফন ওয়াইমার বহুদিন হলো বিজ্ঞান-চর্চা ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। অনেকে বলে তিনি নাকি ভারতে গিয়ে সাধু হয়েছেন। এই খবর পেয়ে আমি তো একেবারে অবাক—কৌতূহল যেন আরও শতগুণ হয়ে উঠল ঐ বিদেশী জ্ঞানীর সম্বন্ধে। য়ুরোপীয়ান গুণীর জন্য পরম শ্রদ্ধা অনুভব করতে লাগলুম—সঙ্গে সঙ্গেই আবার যতীশকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়ে দিলুম যেন সে এই রহস্য-ভরা মহান জীবনকাহিনীর আবরণ উন্মোচনের একটু চেষ্টা করে—একবার যেন সে

বৈজ্ঞানিক ওয়াইমারের বাসস্থানে তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁর পরিবারবর্গের কাছ থেকে সব খবর নিয়ে আমায় জানায়।

—বেশ কিছুদিন পরে যতীশ লিখলে যে সে আমার অনুরোধে কোলোনের যে বিদ্যালয়ে ওয়াইমার শিক্ষকতা করতেন এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের বাসস্থানের গৃহে যেখানে বৈজ্ঞানিকের শৈশব কেটেছিল—এই দুই জায়গাতে গিয়েছিল—কিন্তু বিশেষ কোন খবর পায়নি। আরো অনুসন্ধানে যতীশ বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে যে দুটি কাহিনী শুনেছিল তাও তার পাঠানো সেই রেজিষ্ট্রী প্যাকেটখানিতে ছিল। প্রথমটি যতীশ কোলোনের সেই বিদ্যালয়ে ওয়াইমারের এক পুরানো সহকর্মীর কাছে শোনে। সহকর্মীটি বলেন, তিনি প্রথম থেকেই কেমন একটু খেয়ালীগোছের মানুষ ছিলেন। কোনদিকে একবার ঝোঁক হলে সেই নিয়েই ওয়াইমার আহার-নিদ্রা ভুলে যেতেন। যেমন তিনি হঠাৎ খেয়ালের বশে জীব-বিদ্যার চর্চা শুরু করে দিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন ইতিহাসের ছাত্র এবং তাতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে অধ্যাপনা করতেন। ঐ সময়েই তিনি বিয়ে করেন এবং একটিমাত্র ছেলে নিয়ে তাঁরা খুব সুখে-শান্তিতে ছিলেন। ছেলেটিও তার বাবার মতোই মেধাবী ছিল—নানা রকম বই পড়তো ঐ বয়সেই, আর বেশির ভাগ সময়ই কাটাতে ভালোবাসতো তার বাবার কাছে পড়ে আর গল্প করে। সাত বছর বয়সে ছেলেটি স্কুলে ভর্ত্তি হলো—কিন্তু বছরখানেক যেতেই সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। ওর এক রকমের পেটব্যথা বারবার হয়ে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। ওয়াইমার তার কাছে কাছেই থাকতেন। একদিন ছেলে জিজ্ঞাসা করলে— 'বাবা! ব্যথা কেন হয়? এ কি করে ভালো হবে?' ওয়াইমার লেগে গেলেন শরীর বিদ্যার বই পড়তে এবং ওরই— গোড়া ধরবার জন্য লেগে গেলেন জীব-বিদ্যা নিয়ে। যদিও এ বিষয়ে কোনও ডিগ্রী নেননি— তবু তাঁর মৌলিক গবেষণা এবং বিশেষতঃ ঐ বইখানির জন্য জার্মানীর নানা জায়গা থেকে ভালো ভালো পদে তাঁর আমন্ত্রণ আসতে লাগলো। একটা খুব ভালো জায়গায় ওয়াইমার যাবেনও ঠিক করেছিলেন। এমন সময় কি হতে কি হলো কে জানে— তিনি উঠে পড়ে লাগলেন যতরাজ্যের ধর্মগ্রন্থ-পাঠে। তাঁর গবেষণার টেবিলে খরগোশ আর ইঁদুরের জায়গায় জড়ো হলো স্তূপাকার পুরোণো পুরোণো ধর্মগ্রন্থের স্তূপ। তারপর শুনলুম যে ওয়াইমার সংস্কৃত শিখছেন। আমার বাড়ি থেকে তাঁর বাড়ি ছিল অনেকটা দূরে— তবু আমি একবার তাঁর বাড়িতে যাই তাঁর ছেলের অসুখটা খুব বেশী শুনে। ধর্মচর্চা সম্বন্ধে বলতে জবাব দিলেন— 'খোকনের নানা রকম প্রশ্নের উত্তর জোগাবার জন্য এতো পড়তে হচ্ছে আমার ধর্ম সম্বন্ধে!' কদিন পরেই শুনলাম হঠাৎ ওয়াইমার নিরুদ্দেশ হয়েছেন স্ত্রী আর অতো আদরের রুগ্ন শয্যাশায়ী ছেলেকে ফেলে। আশ্চর্য, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে তিনি একখানি চিঠি দিয়েছিলেন ঃ বন্ধুগণ, আমায় ক্ষমা করবেন। অনেকগুলি এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি—যা আমার জীব-বিদ্যার সমস্যাগুলির চেয়ে অনেক জরুরী এবং হয়তো সেগুলির জবাব পেলেই ঐ সমস্যাগুলির উত্তর আপনিই পাবো। চললেম সেই উত্তরের খোঁজে। অবশ্য সে উত্তর আমি পাবো নিজের

কাছ থেকেই—তবু তার জন্য চাই সাধনা, আর বিশেষ ধরনের জীবন-যাপন। তাই আমার এখন এমন পরিবেশ চাই— যেখানে এই দুটিই সম্ভব হয়। সে স্থান আছে পূর্বে। আমার জন্য ভাববেন না।— ভালোই থাকবো আমি সেখানে। (ঐ চিঠিটা বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধ সহকর্মী যতীশের হাতে দিয়েছিলেন এবং যতীশ সেখানাও ঐ প্যাকেটে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিল।)। সহকর্মীটি আরও বলেন যতীশকেঃ আপনার বন্ধুকে লিখবেন হিমালয়ে ওয়াইমারকে খুঁজতে— সেখানেই হয়তো তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব। বৃদ্ধ এই সব আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অবজ্ঞা ভরে মন্তব্য করে আক্ষেপ জানালেন ঃ ওঃ কি ভাবেই তিনি নিজের অমন জ্ঞান আর শক্তি, সামর্থ্যের অপচয় করলেন— জার্মানীতে থেকে কাজ চালিয়ে গেলে জীব-বিদ্যার কি উৎকর্ষই না ঘটাতে পারতেন ওয়াইমার। সঙ্গে সঙ্গে কি নির্মমভাবেই না নিরুদ্দেশ হলেন স্ত্রী পুত্রের কাছ থেকে—অমন সোনার সংসার ভেঙ্গে—ওঃ!

যতীশ ওয়াইমারের দেশের বাড়ীতে গিয়ে দ্বিতীয় কাহিনীটি পেয়েছিল। বৈজ্ঞানিকের পিতৃপুরুষদের বাসস্থান গ্রামটি কোলোন থেকে পাঁচ সাত মাইল দূরে। মস্ত বাগানওলা সেকেলে বাড়ী। গোলাপের বনে পরীর মাথার কেশের চূড়া থেকে ঝির ঝির করে ফোয়ারা ঝরছে— সবখানে কেমন এক রিক্ততা। সেখানে ওয়াইমারের এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নের সঙ্গে যতীশের দেখা হয়। প্রৌঢ় ভদ্রলোক অবিবাহিত — একাই থাকেন অত বড় বাড়িতে দুটি চাকর নিয়ে। অতো বড়ো বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলায় খুব বিরক্ত। তিনি যতীশকে অনেক কথাই বলেন ঃ ওয়াইমার লোকটাই ছিলেন খামখেয়ালী। তাঁর ছেলেটি অনেকদিন ধরে ভুগছিল। ওয়াইমার তার চিকিৎসা এক রকম নিজেই করছিলেন—অবশ্য তাঁর বন্ধু একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতেন। অসুখ ভালোর দিকেই যাচ্ছিল—এমন সময় হঠাৎ একদিন ওয়াইমার আর কলেজ থেকে ফিরলেন না। বৈজ্ঞানিকের ভাগ্নে দুঃখ করে বললেন ঃ ওয়াইমার এই রকমই একটু দায়িত্বহীন ও খামখেয়ালী ছিলেন। তাঁর চলে যাবার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠবার পর তাঁর স্ত্রী ছেলের চিকিৎসার জন্য পশ্চিম বার্লিন চলে যান। সেখানে যে কি হলো—কোন খবরই আজ পাঁচ বছর ধরে খোঁজ করে কিছু জানতে পারিনি। কিছু টাকা তাঁর ছিল। গুজব শুনি, ছেলেটির নাকি অসুখ বেড়ে যায়, আর তার মা তাকে নিয়ে আমেরিকা চলে গেছেন। এই পাঁচ বছরের মধ্যে একটি খবর নেই, চিঠি নেই — কিছু না। এমনই সব দায়িত্ব জ্ঞানহীন লোক!

যতীশ ভদ্রলোকের অনুরোধে সমস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখে এসেছিল লাইব্রেরী-ঘর, ল্যাবোরেটরী, ড্রইংরুম, শোবার ঘর— একটু প্রাচীনভাবে সাজানো সব জায়গাতেই রাশি রাশি বই। ভদ্রলোক বললেন ঃ অনেক বেচে দিয়েছি— কি হবে ওগুলো এখানে ফেলে রেখে পোকায় কাটিয়ে? যতীশ শোবার ঘরের দেওয়ালে একখানি বিরাট আলোক চিত্র দেখলো— হাসিমুখ সুন্দরী মায়ের গলা জড়িয়ে একটি ৬/৭ বছরের ফুটফুটে ছেলে—নীচে ওয়াইমারের হাতে লেখা— "কাল সমুদ্রে দুটি ঢেউ"। ভদ্রলোক বললেন ঃ ছবিটি মামার তোলা আর

ঐ নামকরণটিও তাঁরই হাতের লেখা। বুঝতে পারছেন তো ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান একটু কমই ছিল।

ভদ্রলোক ওয়াইমারের দুটি তিনটি বিভিন্ন বয়সের ফটো ও কতকগুলি হাতে লেখা কাগজ পত্র (যেগুলি ইংরাজীতে লিখেছিলেন) যতীশকে দিয়েছিলেন। যতীশ সে সবই আমায় ঐ রেজিষ্ট্রী প্যাকেটে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমি পরম যত্নে সেগুলি রেখে দিলুম। বৈজ্ঞানিকের একখানি সাম্প্রতিক ফটো ও দুই তিনটি চিঠি আমার নিজস্ব ডায়েরীর সঙ্গে সর্বদাই ভেতর পকেটে ঠাঁই নিতো। আমার অতৃপ্ত কৌতূহল ঐ বিদেশী বৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে নানা ভাবনায় কেবলই গুঞ্জরণ করে ফিরতো। ভাবতুম এই অদ্ভুত মানুষটি নিশ্চয়ই সাধারণ একজন খাম-খেয়ালী লোক নয়। তাঁর পরবর্তী জীবন ও ধ্যান ধারণা যে কি রূপ গ্রহণ করলো কিছুই জানতে পারলুম না — কেবল নানা কল্পনায় চিন্তার জাল বোনা চলে। তারপর এই বিশ বছর ধরে নিজের নানা ভাবনা ও কাজকর্ম এবং সাংসারিক ব্যাপারে "ওয়াইমার প্রহেলিকা" ও ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে এলো— যদিও "ওয়াইমার" নামটির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিকৃতির সেই দীপ্ত প্রশান্ত মুখ আর সরল টানা টানা হস্তাক্ষর মেঘ-রৌদ্রভরা আকাশে ক্ষণিক দেখা রামধনুর মতো ভেসে উঠতো।

...কিন্তু জগতে মানব বুদ্ধির অগম্য সব বিস্ময়কর ঘটনা সত্য হয়ে দেখা দেয়— তাই বৈজ্ঞানিক ওয়াইমারের পরবর্তী জীবনের রহস্যপুরীর দুয়ারও আমার সমুখে হঠাৎ একদিন আশ্চর্যভাবে উন্মুক্ত হলো। গত বছর অফিসের কাজে হঠাৎ শ্রীনগর যেতে হলো। কাজকর্ম যদিও ভালভাবেই মিটে গেল—হঠাৎ রওনা হবার দুদিন আগে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লুম। কোন মতে টাঙ্গায় করে কাছের এক ডাক্তারখানায় গিয়ে হাজির হলুম। ডাক্তার সাহেব চেম্বারে আমায় পরীক্ষা করছেন, এমন সময়ে ওপাশে ঔষধ নেবার জায়গায় কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে একজন কাশ্মীরী বৃদ্ধের কড়া স্বরে খুব কথা কাটাকাটি ও বচসা শুনলুম। সব কথার মর্ম না বুঝলেও বুঝলুম কম্পাউণ্ডার বলছে ঃ এ ওষুধ পাবে না, ডাক্তারের সই নেই প্রেসক্রিপসনে। তাছাড়া কয়েকটা ওষুধের নামই শুনিনি। কিসে কি হবে—শেষকালে কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে হবে আমাদের। অপর দিকে শুনলুম ঃ গরীব মানুষ হুজুর-মেহেরবানি করে ওষুধ দিয়ে দিন। আট নয় মাইল পথ ভেঙ্গে আমরা পাহাড় জঙ্গলভরা গ্রাম থেকে এসেছি। সেখানে লোকালয়ও নেই-ডাক্তারও নেই। দু'মাস ধরে দু'বছরের ছোট নাতিটি ভুগছে হুজুর, মা-মরা ছেলে। ওষুধ-পথ্য কিছুই দিতে পারি না ভালো করে—ছেলে যায় যায়— হঠাৎ দুদিন আগে—রাতে আমার কুঁড়ের ঝাঁপ ঠেলে ঢুকলেন এক মহাদেবের মতো সন্ন্যাসী (বৃদ্ধের গলা আবেগে বুজে গেল) শিশুর মাথায় হাত রেখে তার শিয়রে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে রোগীর রোগ যে অর্ধেক কমে গেল হুজুর! এই চিরকূট তাঁরই হাতের লেখা— এ কখনও মিথ্যা হতে পারে? ওষুধ দিয়ে দিন হুজুর—গরিবকে বাঁচান...!

—ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষা শেষ হয়েছিল—ঝগড়ার কোনও মীমাংসা তখনও হয়নি, অতএব আমরা দুজনেই এক সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলুম। কম্পাউণ্ডার প্রেসক্রিপশান ডাক্তারের হাতে দিলে—আমিও সেই দিকে চেয়েই এক প্রচণ্ড বিস্ময়ের নাড়া খেলুম— অভিভূতভাবে চেঁচিয়ে উঠলুম ঃ একি ওয়াইমারের হাতের লেখা? ডাক্তারসাহেব! আপনি শীঘ্র এ ওষুধ দিয়ে দিন যদি থাকে—এ একজন বিরাট মানুষের দেওয়া প্রেসক্রিপশান! বলতে বলতে প্রত্যাশা পূর্ণতার আনন্দে উত্তেজিত হয়ে ডাক্তারের হাত থেকে প্রেসক্রিপশানটি হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে সেই দরিদ্র পাহাড়িয়া বৃদ্ধের হাত ধরে ব্যাকুল প্রশ্ন সুরু করে দিলুম ঃ কোথায় তিনি? তাঁর দেখা পাবো কোথায় ... আমি?...

ঃ বাবুসাহেব! তিনি কাল ভোরেই চলে যাবেন অমরনাথের পথে। আপনি কি তাঁকে চেনেন?

ঃ কেমন দেখতে তিনি বলো তো— সাহেবের মতো?

ঃ তিনি দেবতার মতো দেখতে—তুষার শুভ্র তাঁর দেহের ওপরে ধবধবে শাদা জটাশ্মশ্রু। মৌনী কিন্তু সর্বজ্ঞ, এই সাধু বাবার দেখা যে কোন পুণ্যে পেলাম জানিনে! তিনি দিনান্তে একবার সামান্য ফল দুধ ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না! কারও গৃহে রাত্রিবাস করেন না!

ঃ এখন তিনি কোথায় আছেন? বাধা দিয়ে প্রশ্ন করি।

ঃ আমার কুঁড়ের পাশেই একটি চিনার গাছের তলটি পরিষ্কার করে আমার ছেলে ডালপালা লতাপাতা দিয়ে একটি ছোট কুঁড়ে করে দিয়েছে। ইশারায় আমাকে কাগজ আনতে বলে এই চিরকূটটুকু লিখে দিলেন, আর ইঙ্গিতে জানালেন যে তিনি নিঃস্ব সন্ন্যাসী—এ অসুখে যে গাছ গাছড়ার প্রয়োজন, ওষুধ করতে তা' দেখতে পাচ্ছেন না — শহর থেকে ওষুধ আনতে হবে। আমি তাঁর পায়ে ধরে আমি ফেরা পর্যন্ত দয়া করে থাকতে বলেছি, তিনিও শিবের মতো প্রসন্ন হাসিতে আশ্বাস দিয়েছেন আমায়...। হুজুর। মনে হয় অমরনাথের যাত্রাপথে আমার নাতির শক্ত অসুখের বিষয় জানতে পেরে করুণাবশে তাকে প্রাণদান দিতে এসেছেন। ...ওষুধ দিন হুজুর, আমি গ্রামে পৌঁছতেই তো ভোর হয়ে যাবে—রাতে তো পথ হাঁটতে পারবো না— চোখে কম দেখি! ডাক্তারবাবু ও কম্পাউণ্ডার দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন। ডাক্তারবাবু এবার নিজেই তাড়াতাড়ি প্রেসক্রিপশনে যে কটি ওষুধ তাঁর ছিল ঠিক করে দিয়ে দিলেন বৃদ্ধের হাতে। আমি বৃদ্ধকে বললুম ঃ শীঘ্র একটা ট্যাক্সি ডেকে আনো। বৃদ্ধ অবাক হয়ে আমার দিকে চাইতে বললুম—

ঃ আমিও যাব তোমার সঙ্গে সাধু দর্শন করতে।

চারপাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের ট্যাক্সি চিনার গাছের তলে সাধুর কুটীরের কাছে থামলো। কুটীরের অপরিসর পথে হাঁটুমুড়ে ঢুকে তাঁকে দর্শন করে সত্যই ধন্য হলুম। ইনিই বৈজ্ঞানিক ওয়াইমার? সাদা জটাজুট ভরা সেই গৌরবর্ণ সুন্দর সৌম্যমূর্তি তখন ধ্যান মগ্ন-হিমালয়ের